তাঁদেরকে দণ্ডকারণ্যে থাকতে বলেন। মুনিকে প্রণাম করে তিনজন দণ্ডকারণ্যের উদ্দেশ্যে পা বাড়ান। এই বনের প্রাকৃতিক শোভায় তিনজন বিমোহিত। ফল-পুষ্প-গন্ধে ভরা ময়ূরের কেকাধ্বনি, ভ্রমরের গুঞ্জনে চারদিক মুখর। নানারঙ-বেরঙের পাখীর কলকাকলি চারদিকে। সরোবরে পদ্মফুলের মেলা। এই বনে অনেক মুনির বাস। শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে তাদের আনন্দ আর ধরে না। ফলমূল আহার করে পুনরায় তিনজন বন দেখতে বেরোয়। হঠাৎ সামনে এক দুর্জয় রাক্ষসকে দেখতে পায়। তার রক্তচোখ, রাঙা মুখ, মাথায় দীর্ঘ জটা, গোটা শরীরে কাটার দাগ, দীর্ঘ অস্থিসার দেহ, কাঁধে পচা মাংসের বোঝা—তার দুর্গন্ধে সবাই পালিয়ে যায়। মাঝে মাঝে মেঘের মতো গর্জন করে। এই বিকট রাক্ষসের নাম 'বিরাধ'। এই রাক্ষস সীতাকে কোলে তুলে নেয় এবং তর্জন-গর্জন শুরু করে। শুধু সীতা নয় দুই ভাইকে আজ সে ভক্ষণ করবে বলে ইচ্ছা প্রকাশ করে। শ্রীরামচন্দ্র নিজের পরিচয় দিয়ে রাক্ষসকে তার পরিচয় দিতে বলেন। সে বলে তার পিতার নাম 'কাল'। সে বহুমুনিকে ভক্ষণ করেছে, আজ তাদের পালা। রামচন্দ্র দিশাহারা। রাক্ষসকে বধ করার জন্য লক্ষ্মণ তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। এরপর রাক্ষসের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। সবশেষে 'ঐষিকবাণ' নিক্ষেপ করে 'বিরাধে'র দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন রামচন্দ্র। তাঁর পায়ের কাছে পড়ে থাকে রক্তাক্ত খণ্ডিত রাক্ষসের দেহ। মাটিতে পতিত সীতা মূর্চ্ছা যান। মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তে বিরাধ রামের বাণের স্পর্শে শাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে—এজন্য রাম-সীতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তার পূর্ব জীবন-কথা বলেন। কুবের শাপেই তার এই অবস্থা। তার নাম কিশোর। সে কুবেরের চর ছিল। একদিন নারীদের মাঝে কুবের তাকে নিয়ে যায়। তাকে দেখে নারীগণ লজ্জিত হয়। ধনেশ্বর কুবের সেই মুহূর্তে তাকে অভিশাপ দেয় 'দণ্ডক কাননে গিয়া হও নিশাচর'। পরে বহু অনুনয়-বিনয়ের পর কুবের বলেন যে শ্রীরামের শরেই তার শাপমুক্তি ঘটবে। রামচন্দ্রকে দর্শন করে তার শরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বিরাধ তার দেহকে অগ্নিতে দাহ করতে বলে। লক্ষ্মণের উদ্‌যোগের দানবের দেহ পুড়ে ছাই হল এবং বিরাধ দিব্য দেহ ধারণ করে দিব্যরথে চড়ে স্বর্গারোহণ করে।

খর দূষণের যুদ্ধে আগমন ঃ চৌদ্দজন বীর রাক্ষসকে শ্রীরামের তীরে নিহত হতে দেখে ভয়ে সূর্পণখা খরের কাছে গিয়ে সব জানায়। খর উত্তেজিত হয়ে বলে, 'ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ" চৌদ্দ হাজার নিশাচরকে অস্ত্রে সজ্জিত করে স্বর্ণরথে চড়ে খর-দূষণ রাম-লক্ষ্মণকে হত্যা করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করে। সীতাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে এক গুহায় রেখে আসার জন্য লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিয়ে রাম একাই বিশাল রাক্ষস দলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেন। অন্তরীক্ষ থেকে দেব-দৈত্য-গন্ধর্ব সকলে এই যুদ্ধ দেখে। রামচন্দ্রকে ঘিরে ফেলে রাক্ষসগণ। খরের সঙ্গে রামচন্দ্রের তুমুল যুদ্ধ হয়। উভয়ের দেহ রক্তাক্ত। সহস্রবাণ, গন্ধর্ব অস্ত্র ইত্যাদির দ্বারা শত শত রাক্ষস সৈন্য নিহত হয়। বাকী শুধু খর ও দূষণ। শূলের দ্বারা রাম দূষণের দুই হাত কেটে ফেলে। তারপর দূষণের মৃত্যু হয়। দূষণের ও অন্যান্য বীর রাক্ষস সৈন্যদের মৃত্যু দেখে খর সশস্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে রামচন্দ্রের উপর। নানা অস্ত্র ও তীরের দ্বারা রাম একে একে খরের হাতে ধনুর্বাণ ও তার রণধ্বজ পতাকাকে ছিন্ন ভিন্ন করে এবং রথের আটটি ঘোড়াকে নিহত ও সারথীর মুণ্ডকে ছেদন করে। এরপর খর গদাযুদ্ধ শুরু করে, ত্রিভুবনে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। অগ্নিবাণের দ্বারা খরের গদা ধ্বংস হয়। শেষ অস্ত্রহীন খর তীক্ষ্ম দাঁত দিয়ে রামচন্দ্রকে কামড় দিতে গেলে ঐষিক বাণের দ্বারা খর ধরাশায়ী হয়। চোদ্দ হাজার রাক্ষস সহ খর-দূষণের ভবলীলা সাঙ্গ করার জন্য দেবগণ তুষ্ট হন। রামচন্দ্রের রক্তাক্ত দেহ দেখে সীতার দু চোখ বেয়ে অশ্রুধারা বয়ে যায়। রামচন্দ্রের বীরত্ব দেখে সূর্পণখা ভয়ে ও দুঃখে লঙ্কায় পালিয়ে গিয়ে রাবণকে সব কিছু খুলে বলে। সেই সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ ও সীতার কথাও বলে। সীতার রূপ সৌন্দর্য, সে রাবণের কাছে তুলে ধরে। রাবণই তার উপযুক্ত বলে রাবণকে উত্তেজিত করে। সূর্পণখা রাম-লক্ষ্মণকে ধোঁকা দিয়ে সীতাকে হরণ করে আনবার জন্য পরামর্শ দেয়। সুন্দরী সীতার কথা রাবণ মনে মনে ভাবতে থাকে এবং কিভাবে তাকে হরণ করা যায় তার চিন্তায় মগ্ন হয়।

'সীতাহরণ করিতে রাবণকে মারীচের নিষেধ'— অংশে দেখা যায় পুষ্পক রথে চড়ে রাবণ মারীচের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়। রাবণকে দেখে মারীচ ভয় পায়। দণ্ডকারণ্যে নিশাচর রাক্ষসদের রামচন্দ্র কি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে সে সব খুলে বলে। ভাই-দূষণ-খরও বেঁচে নেই। বলশালী মারীচ থাকতে এ কলঙ্ক রাবণ সহ্য করতে পারছে না। সূর্পণখার নাক-কান কেটে দেবার জ্বালাও প্রকাশ করে। চরম বিপদে পড়েই রাবণ মারীচের শরণাপন্ন হয়েছে। তাই প্রতিশোধের জন্য সীতা হরণের কথা তুলে ধরে। মারীচ এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারে না, বরং সীতাকে হরণ করলে লঙ্কাপুরী ছারখার হবে রাবণের বংশ ধ্বংস হবে—এই ভবিষ্যৎবাণীও করে। রাবণ তাতে কর্ণপাত না করে মারীচকে সোনার হরিণের বেশ ধারণ করতে বলে। কিন্তু মারীচ এর ভয়ংকর ফলাফলের কথা তুলে ধরে সীতার প্রতি লোভ পরিত্যাগের জন্য রাবণকে অনুরোধ করে। কিন্তু তার পরামর্শে কর্ণপাত না করে রাবণ ক্রোধে উন্মত্ত হয়।

'রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা প্রদান'—অংশে বারংবার মারীচ সীতাহরণ থেকে রাবণকে নিবৃত্ত থাকার জন্য সৎ পরামর্শ দিলে রাবণ ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করবে বলে গর্জন করে। শুধু তাই নয় 'দেব পঞ্চানন'ও যদি নিষেধ করেন রাবণ তাও গ্রাহ্য করবে না বলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং মারীচকে মায়ামৃগ সেজে রামকে কুটীর থেকে বনের গভীরে আনতে পরামর্শ দেয় এবং রামহীন শূন্য কুটীর থেকে সে সীতাকে হরণ করবে বলে জানায়। সীতাহরণ অত সহজ নয়। রামচন্দ্রকে মায়ায় বুলিয়ে আনলেও লক্ষ্মণ সীতাকে পাহারা দেবে। লক্ষ্মণ থাকা অবস্থায় সীতা হরণ অসম্ভব। এই সব প্রতিকূল অবস্থার কথা জেনে শুনেও সীতাহরণ করলে লঙ্কাপুরী ছারখার হবে বলে মারীচ এই কুকর্ম থেকে রাবণকে নিরস্ত করার জন্য সুমন্ত্রণা দেয়।

'মারীচের মৃগরূপধারণ'—অংশে দেখা যায় সূর্পণখা রাবণকে নিয়ে পঞ্চবটী বনে যায় মারীচ সহ। সেখানে মারীচকে মৃগরূপ ধারণের নির্দেশ দিলে নিরূপায় মারীচ বিচিত্ররূপে স্বর্ণছটায় দেহকে সজ্জিত করে। তার নয়ন লোভন স্বর্ণরূপ দেখে রাবণ আনন্দিত হয়।

'মায়া মৃগরূপধারী মারীচ বধ'—অংশে দেখা যায় রাবণ অরণ্য মধ্যে লুকিয়ে আছে আর বনভূমি আলোকিত করে স্বর্ণ মৃগরূপী মারীচ রাম-সীতার সামনে হাজির। রাক্ষসবংশ ধ্বংস ও দেবতাদের বিপদ থেকে রক্ষার জন্যই যেন বিধাতার নির্দেশেই এই স্বর্ণ মৃগের নির্মাণ। সীতা এই হরিণকে চায়। তার সোনার চর্মে উপবেশনের আকাঙ্খা প্রকাশ করে। মায়াবী রাক্ষসদের কথা লক্ষ্মণ তুলে ধরে। মায়ার জাল বিস্তার করে তাদের সর্বনাশের জন্য এই মায়ামৃগের আগমন ঘটেছে বলে লক্ষ্মণ সংশয় প্রকাশ করে। সব কিছু শুনেও রামচন্দ্র সীতার মনবাঞ্ছা পূরণের জন্য মৃগ হত্যার জন্য বের হন। যাবার সময় লক্ষ্মণকে সীতা রক্ষার দায়িত্ব দেন। মারীচের উভয়সংকট। তার মৃত্যু হয় রাম নয় রাবণের হাতে। তবে রামের হাতে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে সে। রামচন্দ্রের সঙ্গে বনের মধ্যে লুকোচুরি খেলতে শুরু করে। মারীচের মায়ারূপ ধরতে পেরে রাম 'ঐষিক বিশিষ্ট' বাণ নিক্ষেপ করে। আহত মারীচ মৃত্যুর আগে রামের কণ্ঠস্বর নকল করে লক্ষ্মণকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য আর্তনাদ ক'রে মৃত্যু বরণ করে। রামচন্দ্র সমগ্র ছলনা বুঝতে পেরে কুটীরের দিকে দ্রুত গমন করেন।

'রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ'— অংশে রামের কণ্ঠস্বর শুনে সীতা দেবর লক্ষ্মণকে রামের অনুসন্ধানে যাত্রার জন্য করুণ মিনতি করে। লক্ষ্মণ সীতাকে একা রেখে যাওয়া ঠিক হবে না, রামচন্দ্রকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না ইত্যাদি নানা কথা বলাতে দিশেহারা সীতা কটু বাক্য প্রয়োগ করে।

"বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন।

আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার আছে মন।" —লক্ষ্মণ ভাই এর উদ্দেশ্যে না গেলে সীতা আত্মহত্যা করবে বলে প্রস্তুত হয়। মন না মানলেও সীতার দুঃখ-বেদনা বুঝতে পেরে গণ্ডী কেটে তার বাইরে যাতে সীতা না যায় তার নির্দেশ দিয়ে লক্ষ্মণ রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

এই সুযোগের তপস্বীর বেশ ধরে রাবণ কুটীর দ্বারে হাজির। সীতার রূপ মাধুর্যে রাবণ মুগ্ধ। রাম-লক্ষ্মণ ফিরে এলে ফলমূল দিয়ে অতিথি সৎকারের কথা সীতা বলে। সেই সঙ্গে নিজের পরিচয়ও দেয়। ভণ্ড তপস্বীরূপী রাবণ সীতাকে কুটীরের বাইরে এসে ভিক্ষা দিতে বলে। প্রভুর আদেশ ছাড়া সীতা বাইরে আসতে অস্বীকার করলে ধর্ম-কর্মের কথা বলে সীতাকে প্রলুব্ধ করে। সহজ সরল মনে সীতা লক্ষ্মণের গণ্ডীর বাইরে ফল তপস্বীকে দিতে গেলে রাবণ তার হাত ধরে ফেলে এবং স্বমূর্তি ধারণ করে। সীতা রাবণকে অভিসম্পাত দিতে থাকে। রাবণ তার মনোবাসনার কথা বললে সীতা তাকে ভর্ৎসনা করতে থাকে। এদিকে ভীষণ রাক্ষস মূর্তি ধারণ করে জোর করে সীতাকে রথে ওঠায় অসহায় সীতা রামচন্দ্রকে স্মরণ করে, বনের গাছ-পালার উদ্দেশ্যে তার করুণ আবেদন— তার এই অসহায় অবস্থার কথা যেন রামকে তারা জানায়। দুচোখে অশ্রুবন্যা। দ্রুতগতিতে রথ ধাবিত। আকাশ পথে জটায়ু পাখী পথ রোধ করে। জটায়ুর সঙ্গে রাবণের মহাযুদ্ধ শুরু। বত্রি হাজার বাণে ক্ষতবিক্ষত জটায়ু তবু প্রাণপণে যুদ্ধ করে। 'অর্দ্ধচন্দ্র' বাণে তার দুটি পাখা বিচ্ছিন্ন হয়। সীতা তাকে রাবণের এই কুকর্ম বার্তা পৌঁছে দিতে বলে। জটায়ু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—

'তোমারে উদ্ধারিবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।'

আকাশ পথে যাবার সময় সীতা তার দেহের অলংকারদি মাটিতে ছড়িয়ে দেন। পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীর উদ্দেশ্যে সীতার কাতর বাণী ধ্বনিত।

পথিমধ্যে জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র 'সম্পাতিনন্দনে'র সঙ্গে দেখা। দুই পাখা দিয়ে সে রাবণের রথকে ঢেকে দেয়। সে জানতে পারেনি জটায়ুর অন্তিম দশার কথা। রাবণ তাকে সূর্পণখার কথা, খর-দূষণের হত্যার কথা বলে। সীতা হরণের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করে সুপার্শ্বের হাত থেকে রক্ষা পায়। অসীম সমুদ্র পেরিয়ে লঙ্কাপুরীতে এসে রাবণ সীতাকে অশোক কাননে বন্দিনী করে রাখে। সীতার দুঃখে দেবগণ দুঃখিত। ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র অশোক কাননে গিয়ে সীতাকে সান্ত্বনা দেয়—

'সাগর বান্ধিয়া রাম সৈন্য করি পার।
রাবণে মারিয়া তোমা করিবে উদ্ধার।।'

সীতাকে পরমান্ন দিয়ে এবং প্রতিদিন সুধা ফল দিয়ে যাবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেন ইন্দ্র। অশোক কাননে একাকী বন্দিনী সীতা—আর পঞ্চবটী বনে সীতাশূন্য কুটীরের উদ্দেশ্যে উৎকণ্ঠায় রামচন্দ্রের যাত্রা।

'শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ'-

হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে পথে অমঙ্গলের নানা চিহ্ন দেখে রামচন্দ্রের মনে জেগেছে নানা চিন্তা। মারীচের কপট আহ্বানে লক্ষণ কি সীতাকে একলা রেখে রামের খোঁজে বের হয়েছে? সীতাকে দেবতাগণ যেন রক্ষা করেন। বিধাতা কি দুঃখের উপর দুঃখ দিবে? ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে রাম যখন দিশেহারা ঠিক সেই মুহূর্তে লক্ষ্মণের সঙ্গে তাঁর দেখা। সীতাকে ভয়ংকর দণ্ডকারণ্যে একা রেখে লক্ষ্মণের আগমনে সীতার জীবনে নেমে এসেছে

দুর্যোগ। একথা নিশ্চিতভাবে ঝুঁকি দেওয়ামাত্র একদিকে কর্মফল অন্যদিকে লক্ষ্মণকে বুদ্ধিনাশের অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন রাম। মারীচের মৃতদেহ দেখিয়ে দুইভাই অতিদ্রুত কুটীর দ্বারে উপস্থি হলেন। 'সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বারে।' কোনো উত্তর না পেয়ে রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত প্রায়। পাগলের মতো দুই ভাই তন্ন তন্ন করে বনে, গোদাবরী তীরে সীতাকে খুঁজে বেড়ান। সীতাকে না পেয়ে কেঁদে কেঁদে শ্রীরামচন্দ্র চারদিক অন্ধকার দেখেন। বনের পশু-পাখি, বনের মুনি-ঋষিগণ এসে তাঁকে প্রবোধ দেন। তাঁর মুখে শুধু 'সীতা, সীতা'। সীতার শোকে অস্থির রামচন্দ্রকে ভাই লক্ষ্মণ ভূমি থেকে তুলে কোলে নেন। ভাই-এর উদ্দেশ্যে তাঁর কাতর আর্তনাদ—

"কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।।"

রামচন্দ্রের মনে হয়—হয়তো সীতা মুনিপত্নীদের কাছে গেছেন, হয়তো গোদাবরী তীরের কমল কাননে লুকিয়ে আছেন, হয়তো বা রাহু তাকে গ্রাস করেছে। অথবা মা বসুন্ধরা রাজ্যহারা রামচন্দ্রের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সীতাকে নিজ কোলে আশ্রয় দিয়েছেন। সীতাকে হারিয়ে রামচন্দ্র চারদিক অন্ধকার দেখছেন। তাঁর জীবনে সীতাই একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান। সীতা ছাড়া রামচন্দ্র 'মনীহারা ফণী।' ভাই লক্ষ্মণের কাছে তার কাতর আবেদন—যে করেই হোক সে যেন সীতাকে খুঁজে বের করে এবং তাঁর জীবন বাঁচায়। সীতাহীন তপোবন শূন্যময়। পশু-পাখি-বৃক্ষ সবাইকে ডেকে ডেকে সীতার অনুসন্ধান করার সময় সীতার ভূষণ ও অলংকারাদি, রথের চূড়া, চাকা ইত্যাদি দেখে সেই স্থান ভালভাবে দেখবার জন্য রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলে। সামনে সুউচ্চ পর্বতের আড়ালে সীতা থাকতে পারে ভেবে রামচন্দ্র ধনুর্বাণে পর্বতকে ধূলিসাৎ করতে চাইলে লক্ষ্মণ তা বারণ করে। সীতাহারা পাগল প্রায় রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ নানাভাবে প্রবোধ দিতে গেলেও শোকাকুল রামচন্দ্র তার কথা শুনতে চান না। সীতার জন্য সৃষ্টি ধ্বংসের উদ্যোগ নিলে লক্ষ্মণ তাঁকে নিরস্ত করে। একের অপরাধে অন্যে কেন ধ্বংস হবে? অনেক বোঝানোর পর দুই ভাই মিলে সীতার অনুসন্ধানে পথ চলতে শুরু করেন। পথে নদী-গিরিকে সীতার খোঁজ দেবার জন্য রামচন্দ্র কেঁদে কেঁদে অনুরোধ জানায়। চারদিক ঘুরতে ঘুরতে রক্তাক্ত জটায়ুকে দেখে রামচন্দ্রের মনে হয়েছে নিশাচর রাক্ষস পাখীর বেশ ধরে সীতাকে ভক্ষণ করেছে। তাই তাকে হত্যা করার মূহুর্তে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের বৃত্তান্ত জটায়ু রামচন্দ্রকে বলে। শূন্য কুটীর পেয়ে রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় চলে গেছে। জটায়ু রামচন্দ্রের আশায় বহুক্ষণ তার রথের গতিপথ আটকে যুদ্ধ করেছে কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে নি। দশরথ জটায়ু মিত্র নিজের পরিচয় দিলে রামচন্দ্র অনুতপ্ত হন এবং রাবণ কেন সীতাকে হরণ করলো সেকথা শুনতে চান। চোদ্দ হাজার রাক্ষস বধ, সূর্পণখার নাক-কান কাটার প্রতিশোধ নেবার জন্যই সমুদ্রতীরে লঙ্কায় মহাতেজস্বী লঙ্কেশ্বর রাবণ সীতাকে নিয়ে গেছে। তবে জটায়ু রামকে চোখের জল মুছে চিন্তা দূর করতে বলে। স্পষ্টভাবে আশার বাণী শুনায়—

"কোন চিন্তা না করিহ সম্বর ক্রন্দন।
জানকীরে উদ্ধারিবে মারিয়া রাবণ।।"

তারপর শ্রীরামচন্দ্রের চরণামৃত মুখে নিয়ে সব দোষকে নাস করে জটায়ু পরলোকগমন করে। রাম-লক্ষ্মণ তার বন্দনা করেন। দিব্যরথে জটায়ু স্বর্গারোহণ করে।

জটায়ু উদ্ধার'—অংশে পিতৃতুল্য জটায়ুর শবদেহের সৎকার এবং গোদাবরীর জলে রাম-লক্ষ্মণ তর্পণ করেন। রামচন্দ্রের দর্শনেই জাটায়ুর স্বর্গবাস হলো।

'কবন্ধ ও শবরীর স্বর্গে গমন'— রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে রাম-লক্ষ্মণ ফিরে আসেন শূন্য কুটীরে। রামচন্দ্র শূন্য ঘরে কেঁদে কেঁদে সারা—চোখে তার ঘুম নেই. ভোর হতেই দু-ভাই সীতার খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। কুশ বনে ভয়ংকর নানা অমঙ্গালের চিহ্ন দেখা দেয়। এক বিদ্‌ঘুটে বিশালদেহধারী কবন্ধ তাঁদের পথ আটকায় এবং দুজনকে ভক্ষণ করবে বলে জানায়। কবন্ধ তাঁদের পরিচয় জানতে এবং কেন এই বনে প্রবেশ করেছে তা জানতে চায়। এ সবের কোনো উত্তর না দিয়ে দু-ভাই কবন্ধের দুই হাত কেটে ফেলে। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে তাদের পরিচয় আবার জানতে চায়। লক্ষ্মণ নিজেদের বংশ পরিচয় ও বনে আসার কারণ বলার পর কবন্ধের পূর্বের স্মৃতি জেগে ওঠে। তার নাম ছিল কুবের। রূপের অহংকার তার ছিল। মুনির শাপে তার রূপ নষ্ট হয়। তবে বিষ্ণুর অবতার রামের বাণস্পর্শে আমার মুক্তি ঘটবে। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বজ্রাঘাত করলে তার হাত ছাড়া অন্য অঙ্গাগুলি উদরের মধ্যে ঢুকে গেছে। তার গতিশক্তি নেই। দুইহাতই একমাত্র সম্বল। তবে রামচন্দ্রকে দেখতে পেয়ে সে আজ ধন্য। রামচন্দ্র তার কাছে সীতার সংবাদ জানতে চাইলে তার দেহের সৎকার আগে করতে বলে। দুই ভাই মিলে সযত্নে কবন্ধের দেহ সৎকার করলে আগুনের ভিতর থেকে অদ্ভুত আকারের জীব আকাশে উঠতে উঠতে দেবমূর্তি ধারণ করে রামের উদ্দেশ্যে বলে তাঁরা যেন ঋষ্যমুকে সুগ্রীবের কাছে যায়। রামচন্দ্রকে দর্শনের ফলে কবন্ধের স্বর্গবাস হয়। কুশবনে রাত কাটিয়ে দু-ভাই ভোরবেলা পম্পা নদীতীরে যান। সেখানে পক্ষী-পক্ষিণী, মৃগ-মৃগী, রাজহংস-রাজহংসী মিলনান্দে বিভোর। এদের মিলন মধুর জীবন দেখে রামচন্দ্রের বিচ্ছেদ বেদনা তীব্র রূপ নেয়। তিনি মৃগ পাখীদের ডেকে ডেকে সীতা কোথায় জানতে চান। দুঃখ-দহন জর্জরিত মন ও দেহ নিয়ে পম্পাতে স্নান ও তর্পণাদি করে সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র যাত্রা করেন। মাতঙ্গা আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্র শবর-শবরীর আনন্দ আর ধরে না। এতদিন ধরে তারা মাতঙ্গা মুনির সেবা করেছে। মুনি বৈকুণ্ঠধামে চলে যাবার আগে শ্রীরামচন্দ্র এই আশ্রমে আসবেনই বলে গেছেন। শ্রীরামের দর্শনের পর শবরীর শাপমোচন হবে। সে নিজেই অগ্নিকুণ্ড রচনা করে সে তাতে প্রবেশ করে। শ্রীরামের প্রসাদে শবরীর স্বর্গধামে যাত্রা। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই কৃত্তিবাস অরণ্যখণ্ডের সমাপ্তিতে লিকেছেন—

"শ্রীরাম চরিত্র কথা অমৃতের ভাণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল অরণ্যকাণ্ড।।'

৪৪.৫ সার সংক্ষেপ

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ৭টি কাণ্ডে সমাপ্ত। কাণ্ডগুলি হলো—আদি কাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ড। অরণ্যকাণ্ডে 'চিত্রকূট পর্বতে' শ্রীরাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের স্থিতি ও রাক্ষসের উৎপাত জন্য তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান'—দিয়ে শুরু এবং 'অত্রিমুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও উক্ত মুনিপত্নীর নিকট সীতার জন্মাদি কথন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক বিরাধ বধ', শরভঙ্গা মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের গমন ও মুনি কর্তৃক ইন্দ্রের ধনুর্বাণ দান এবং মুনির স্বর্গে গমন, ' 'দশবৎসর কাল শ্রীরামচন্দ্রের নানা বনে ভ্রমনান্তর, পঞ্চবটী বনে তাঁহার অবস্থিতি ও লক্ষ্মণ কর্তৃক সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক চতুর্দশ রাক্ষস বধ', 'খর-দূষণের যুদ্ধে আগমন,' শ্রীরামের সহ যুদ্ধে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসসহ দূষণ ও খরের মৃত্যু,' 'রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা প্রদান,' মারীচের মৃগরূপ ধারণ,' 'শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ'—এই কয়েকটি ঘটনা চিত্রের সন্নিবেশ দেখা যায়। এই খণ্ডের সার সংক্ষেপ হল—চিত্রকূট পর্বতে রাম-সীতা লক্ষ্মণের অবস্থান। মুনিদের কাছে রাক্ষসদের উৎপাত সম্পর্কে নানাকথা শ্রবণ। রাম-সীতা লক্ষ্মণেব প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রেখে এবং সাবধানে থাকবার পরামর্শ দিয়ে মুনিদের বনত্যাগ। রামচন্দ্র গভীর ভাবনায় ভাবিত। এরপর অত্রিমুনির আশ্রমে শ্রীরামের

গমন। সেখানে মুনিপত্নী সমাদরে সীতাকে গ্রহণ করেন। সীতার কাছ থেকে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত শুনে সীতাকে সস্নেহে কোলে তুলে নেন। অভিশপ্ত বিরাধের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের প্রচণ্ড যুদ্ধ। বিরাধের রামের হাতে মৃত্যুতে অভিশাপ মোচন ও তার স্বর্গারোহণ। শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের গমন। তাঁকে দেখে মুনি খুবই তুষ্ট। রামচন্দ্রের হাতে ইন্দ্রের ধনুর্বাণ দিয়ে মুনির স্বর্গারোহণ। দীর্ঘ দশবছর বিভিন্ন অরণ্যে ঘুরে ঘুরে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের পঞ্চবটী বনে আগমন। বনে ভ্রমণকালে অগস্ত্য মুনির সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ। ইল্বল-বাতাপি এই দুই মায়াবী রাক্ষসের জীবনবৃত্তান্ত ও মৃত্যুকাহিনী রামচন্দ্র শোনেন। অগস্ত্যমুনি তাঁকে গোদাবরী নদীতীরে সুশোভিত পঞ্চবটী বনে বাস করতে বলেন। অগস্ত্যমুনির আশ্রম ত্যাগ করে চলে যাবার পথে জটায়ুর সঙ্গে তাঁদের দেখা। এই জটায়ু তাঁদের পঞ্চবটী বনে নিয়ে যায়। এই বনের সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ। লতা-পাতা দিয়ে কুটীর নির্মাণ। পঞ্চবটীবনে তিনজনে সুখে দিনযাপন করছিলেন। হঠাৎ রাবণের ভগ্নী সূর্পণখার আবির্ভাব। প্রথমে রামকে পতিরূপে পাবার জন্য তার অনুনয় বিনয়। পরে লক্ষ্মণকে পতিরূপে পাবার জন্য শত চেষ্টা। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে রাক্ষসী সীতাকে গিলে খেতে যায়। তখন লক্ষ্মণ তীর নিক্ষেপ করে তার নাক কান কেটে দেয়। ক্রোধে দিকহারা হয়ে সূর্পণখা খর ও দূষণের কাছে গিয়ে প্রতিশোধ নিতে বলে। সুর্পণখার অবস্থা দেখে তার কান্নাকাটি শুনে দুই রাক্ষস সেনাপতি রাম-লক্ষ্মণকে হত্যার জন্য ছুটে যায়। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। চোদ্দশ রাক্ষস সৈন্য ও খর-দূষণ প্রচণ্ড যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়। হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে সূর্পণখার রাবণের কাছে গমন। প্রেম প্রত্যাখ্যান ও নাক-কান কেটে দেওয়ার প্রতিশোধ নেবার জন্য সূর্পণখা সীতার রূপ-মাধুর্য তুলে ধরে রাবণকে কামনা বাণে বিদ্ধ করে সীতাদেবীকে হরণের পরামর্শ দেয়। শুধু তাই নয় রামচন্দ্রের হাতে চোদ্দহাজার রাক্ষস ও খর-দূষণের মৃত্যুরও প্রতিশোধ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। রাবণ-সূর্পণখার প্ররোচনার ফাঁদে পা দিয়ে সীতাহরণের ব্যাপারে মারীচের কাছে যায়। মারীচ তাকে এই কু-পথে যেতে শত বারণ করে, অনেক সুমন্ত্রণা দেয়। কিন্তু রাবণ সব যুক্তি নস্যাৎ করে সীতাহরণের ব্যাপারে অটল থাকে এবং এই কাজে মারীচ সম্মত না হলে তাকে হত্যার হুমকিও দেয়। মারীচ বাধ্য হয়ে মৃগরূপ ধারণ করে। সোনার হরিণ দেখে সীতা প্রলুব্ধ হয় এবং রামচন্দ্রকে এই মৃগ ধরে আনতে বলে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রামচন্দ্র তীর ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যাবার সময় সীতা ও লক্ষ্মণকে সাবধান করে। মায়াবী মারীচের রামের মতো কণ্ঠস্বরের আর্তনাদ শুনে সীতা-লক্ষ্মণকে রামের অনুসন্ধানে পাঠায়। লক্ষ্মণের সীতাকে একাকী রেখে যাবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না। কিন্তু সীতার নানা কটূক্তি শুনে গণ্ডী এঁকে তার বাইরে যেতে সীতাকে বারণ করে। লক্ষ্মণ চলে যাবার পর, তপস্বীর ছদ্মবেশে রাবণের আগমন ও অভিনয়। তার অভিনয়ে ভুলে এবং গার্হস্থ্য ধর্মরক্ষা করার জন্য গণ্ডী পেরিয়ে ভিক্ষা দান। মূহুর্তে সীতাকে অপহরণ করে রাবণের আকাশপথে গমন। সীতার বক্ষভেদী আর্তনাদ ও নদ-নদী পাহাড়-পর্বত গাছপালা পশু-পাখী সকলের উদ্দেশ্যে তার আকুল আবেদন—তারা যেন এই দুঃসংবাদ রামচন্দ্রকে দেয়। পথে জটায়ুর সঙ্গে তুমল যুদ্ধ। রক্তাক্ত জটায়ু পাখীর অবরোধ চূর্ণ। রক্তাক্ত জটায়ুর কাছ থেকেই রামচন্দ্র সীতাহরণের ঘটনা জানতে পারে। সীতাহীন শূন্য কুটীরে এসে রামচন্দ্রের বিলাপ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস-বনানী-বেদনা-বিধুর। পাতি-পাতি করে পর্বতের গুহাদি, গোদাবরীর তীরভূমি, বনভূমি খুঁজে খুঁজে রামচন্দ্র দিশেহারা। হঠাৎ কবন্ধের সঙ্গে দেখা। তার অভিশপ্ত জীবনের অবসান ঘটান রামচন্দ্র। আগুনে তার দেহদাহের পর আগুনের শিখা থেকে আকাশে এই অভিশপ্ত মুক্ত রাক্ষস চলে যাবার সময় রামচন্দ্রকে ঋষ্যমুকে সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে বলে। তার সাহায্যেই সীতা উদ্ধার হবে। এই ইঙ্গিত দিয়ে যায়। এরপর রাম-লক্ষ্মণ কুশের বনে প্রবেশ করে। পম্পা নদীতে স্নান করে দুই ভাই মাতঙ্গ আশ্রমে যান। সেখানে রামদর্শনে শবরীর শাপমুক্তি ঘটে। আর দুই ভাই সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শবরীর মুক্তি ও শ্রীরামচরিত্রের গুণ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে অরণ্যকাণ্ডের সমাপ্তি।

৪৪.৬ (ক) প্রকৃতি চিত্র, (খ) যুদ্ধ বর্ণনা, (গ) চরিত্র চিত্রণ

(ক) প্রকৃতি চিত্র ঃ কোমল পেলব শস্য-শ্যামল বাংলার প্রকৃতি চিত্র বাংলা সাহিত্যে যুগে নানারূপ যুগে বৈচিত্র্য নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীনযুগে চর্যাপদে, আদি মধ্যযুগে কৃষ্ম কীর্তনে এবং অন্ত্য মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্য শাখায়, বৈষ্ণব পদাবলীতে ও মঙ্গালকাব্য ধারায় আমরা প্রত্যক্ষ করি। আপনারা কৃত্তিবাসের 'অরণ্যখণ্ডে' এই প্রকৃতি চিত্রের মনোরম রূপ দেখতে পাবেন। আদি কবি মহামুনি বাল্মীকির রামায়ণে প্রকৃতি বর্ণনায় বিস্তৃতি দেখা যায়। অনুবাদক কৃত্তিবাস মূল মহাকাব্যের মতো প্রকৃতির ব্যাপক বৈচিত্র্য বৈভব রূপ তুলে না ধরলেও এই খণ্ডের কয়েকটি অংশে প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শকে সার্থকভাবেই প্রকাশ করেছেন। এই অংশের কয়েকটি স্থানের প্রকৃতি চিত্রণের রূপরেখা আপনাদের সামনে তুলে ধরা হল। এর মধ্য দিয়েই প্রকৃতি প্রেমিক কৃত্তিবাসকে আপনারা চিনতে ও জানতে পারবেন।

দণ্ডকারণ্যের বর্ণনা ঃ অত্রিমুনির কণ্ঠে শোনা যায়—

"অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্যস্থান.
তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান।।"

এই অতিরম্য স্থান' অংশটির মধ্য দিয়েই কৃত্তিবাস আমাদের হৃদয় গভীরে দণ্ডকারণ্য বনভূমির সৌন্দর্যের প্রতি ঔৎসুক্য বোধ জাগ্রত করেছেন।

অত্রিমুনির চরণধূলি নিয়ে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ দণ্ডক কাননে প্রবেশ করেন। আগে রাম, মধ্যে সীতা ও পশ্চাতে লক্ষ্মণ। অরণ্য ভূমি ফল ও ফুলে পরিপূর্ণ। এ সবের গন্ধে বনভূমি আমোদিত। অবাধ উন্মুক্ত বনে ময়ূর-ময়ূরী প্রাণের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কেকাধ্বনিতে চারদিক মুখর। ফুলের মধু আহরণের জন্য ভ্রমরের দল গুঞ্জনে বনভূমি ভরিয়ে দিয়েছে। রঙ-বেরঙের নানাপাখী গাছের ডালে ডালে বসে, এদিক-ওদিক উড়ে বনভূমিকে মধুর কলরবে মুখর করে তুলেছে। বনের সরোবরে অগণিত পদ্মফুল যেন হাসিরাশির খেলা বসিয়েছে। এই বনের জল স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো, ফলগুলি রমণীয় শুধু নয়—উভয়ই সুস্বাদু।

বাল্মীকির রামায়ণে দণ্ডকারণ্যের তাপসগণের আশ্রমের পরিবেশ-পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে মহাকবি প্রকৃতির স্পর্শ এনেছেন। এছাড়া বনমধ্যে প্রবেশের পর বনানীর দৃশ্য সজ্জায় হরিণ, বাঘ, ভালুকের অবাধ বিচরণ ছিন্ন তরুগুল্ম, ঝিল্লিরব এনে শঙ্কার ভাব জাগিয়েছেন। এই সব বর্ণনা অবশ্য কৃত্তিবাসের রামায়ণে নেই।

পঞ্চবটী বন ঃ 'পঞ্চবটী দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী।' রামচন্দ্রের এই সুখের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে পঞ্চবটী বনের প্রকৃতি চিত্র। এই অংশে গোদাবরী নদী ও তার তীর বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। প্রকৃতির কোলে নদীতীরে কুটীর নির্মাণ করে সেখানে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ থাকবার জন্য মনস্থ করেন।

গোদাবরী নদীর দুই তীর 'শ্বেত-পীত-লোহিত' ইত্যাদি নানারঙের পাথরে ভরা। সূর্যের আলোয় এইসব পাথর থেকে নানারঙ ঠিকরে বের হয়। কুটীরের খুব কাছে বিস্তৃত ঘাট। ঘাটটি নানা ফুলে সুসজ্জিত। ফুলের মধু পানের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ছুটে আসে। তাদের গুঞ্জন ধ্বনিতে পরিবেশ মুখর। কুটীরের দ্বার প্রান্তেও নানাফুলের ডালি। সবুজ লতাপাতা ঘেরা কুটীরটি মনোহর।

আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণে পঞ্চবটী বনের বিস্তৃত রূপ সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে. হেমন্তকালের পূর্ণিমার জ্যোৎস্না

স্নাত বন হিমে ম্লান হয়েছে। এরূপ প্রকৃতির বিপরীত-চিত্র সীতার মধ্যে মহাকবি দেখেছেন। বাষ্পাচ্ছন্ন অরণ্য, সোনার ধান কিছুই কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। শীতকালীন প্রকৃতি দৃশ্য অনুপম। এমনটি কৃত্তিবাসের লেখায় নেই।

পম্পা নদী ঃ কুশবনে রাম-লক্ষ্মণ প্রবেশ করে ভোর হতেই দু-ভাই পম্পা নদীতীরে উপস্থিত। সেখানে—

'কেলি করে নানা পক্ষী পক্ষিণী সহিত।
দেখিলেন মৃগ-মৃগী বিচ্ছেদ বঞ্চিত।।
রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে।
দেখিয়া রামের শোক-সাগর উথলে।।'

এই অংশে কৃত্তিবাস পম্পানদীতে অনাবিল প্রকৃতির বুকে অনাবিল মিলন আনন্দের চিত্রের পাশাপাশি সীতা-হারা রামচন্দ্রের বিরহ বেদনাকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বৈসাদৃশ্য চিত্রকল্প এখানে যে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করেছে তা কাব্যগুণে ভরা।

বাল্মীকির বর্ণনায় পম্পা সরোবর স্বচ্ছ স্ফটিকের রূপ পেয়েছে। নদীটিতে শত শত পদ্মফুল বিকশিত, দুই তীরে কোমল বালুকারাশি, মাছ ও কচ্ছপ মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নদীর বুকে নানারঙের জলজ ফুল। নদীর দুই তীর তিলক, অশোক, বকুল প্রভৃতি গাছে ভরা। সখীর মতো লতা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে। মালতী, কুন্দ, অশোক, কেতকী ইত্যাদি নানা ফুলের গাছ। আমগাছগুলি মুকুলে ভরে গেছে। প্রকৃতি জগত মধুর মিলনের কেন্দ্রস্থল।

(খ) যুদ্ধ বর্ণনা ঃ কৃত্তিবাসের 'অরণ্যখণ্ডে' বহু যুদ্ধের বর্ণনা আছে। তার মধ্যে 'বিরাধ বধ', 'খর-দূষণের যুদ্ধ' রাবণের সঙ্গে জটায়ুর যুদ্ধ'—বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আপনারা লক্ষ্য করবেন প্রতিটি যুদ্ধে কৃত্তিবাস ভিন্ন স্বাদে বীর রসকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাণ্ডটিতে যুদ্ধের ঘনঘটা থাকলেও বৈচিত্র্যের জন্য একঘেয়েমি হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও পটভূমিকায় যুদ্ধগুলি আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়েছে।

বিরাধ বধ ঃ দণ্ডকারণ্যের অত্রিমুনির আশ্রমে আহারাদি শেষে মুনির আশীর্বাদ নিয়ে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ মনের আনন্দে দণ্ডাকারণ্যে ভ্রমণকালে বিকট আকৃতির দুর্জয় রাক্ষস বিরাধের উপস্থিতি। কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন—

"রাঙ্গা দুই আঁখি তার কঠিন হৃদয়।
বনজন্তু ধ'রে মারে কারে নাহি ভয়।।
দুর্জয় শরীর ধরে পর্ব্বত সমান।
জ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখ খান।।"

এখানেই শেষ নয়, মাথায় লম্বা জটা, অস্থিসার দেহে দুর্গন্ধ, কণ্ঠে মেঘের গর্জন ইত্যাদি। এই বর্ণনায় প্রতিপক্ষ বিরাধের ভয়ংকরতাকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন। এই রাক্ষস হুঙ্কার ছাড়ে—

".....আমি যে হই সে হই।
সবারে খাইব আজি ছাড়িবার নই।।"

বহু মুনিকে বধের কথা বলে সে বীভৎস রস সৃষ্টি করেছে। সীতাকে বগলদাবা করে নেয়। দুই ভাইকে আক্রমণের জন্য ছুটে আসে। শ্রীরামচন্দ্র বিরাধের মূর্তি ও হুঙ্কার শুনে ভয় পান। লক্ষ্মণ তাঁকে সাহস জোগায়। রামচন্দ্র প্রথম সাত বাণ নিক্ষেপ করে। কিন্তু তাতে রাক্ষসের কিছুই হয় না। বিরাধ বিশাল জাঠা গাছ লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে

ছুঁড়ে দেয়, তা দেখে রাম একটি তীর নিক্ষেপ করে। তাতে জাঠা গাছ খান খান হয়। নিশাচরের হাতে আর কোনো অস্ত্র নেই। সে আকাশে উঠে যায়। রামচন্দ্র 'ঐষিক বাণ' নিক্ষেপ করেন। সেই বাণে রাক্ষস ভূমিতে পতিত হয়। তার দেহ খণ্ডবিখণ্ডিত। গোটা দেহ রক্তাপ্লুত। এখানেই যুদ্ধ শেষ। পরবর্তী কাহিনী শাপমুক্তির কাহিনী।

শিহরণ জাগানো যুদ্ধ বর্ণনা সর্বাংশে সার্থক হয়েছে। রাক্ষসের ভীষণ রূপ বর্ণনায় শব্দ চয়নের যথার্থতা লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধের প্রাক্কালে রামচন্দ্রের ভীত হওয়ার কার্য-কারণও রয়েছে সীতাদেবীর কবলে পড়ার মধ্যে। লক্ষ্মণের সাহসিকতা, দাদাকে উদ্বুদ্ধ করার বর্ণনায় লক্ষ্মণের চারিত্রিক মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে।

খর-দূষণের যুদ্ধ ঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণে খর-দূষণের যুদ্ধ বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে আছে। সূর্পণখার কাছে রামকর্ত্তৃক চোদ্দজন রাক্ষসের মৃত্যুর কথা শুনে খরের গর্জন—

".....দেখ তুমি আমার প্রতাপ।
ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ।।"

এরপর খর ও দূষণ চোদ্দ হাজার নিশাচর রাক্ষস সহ রাম-লক্ষ্মণকে শায়েস্তা করে সূর্পণখার মনের জ্বালা জুড়াতে যাত্রা করে। আটঘোড়ার রথে চড়ে খরের যুদ্ধ যাত্রা। দূষণের গর্জন—'রামেরে মারিব আগে পশ্চাৎ লক্ষ্মণ' রাক্ষস সৈন্যের কোলাহল শুনে রামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সীতাদেবীকে সরিয়ে নেবার কথা লক্ষ্মণকে বলেন। লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ সে আদেশ পালন করে। এবার যুদ্ধ শুরু। একদিকে রামচন্দ্র একাকী অন্যদিকে চোদ্দহাজার রাক্ষস। অন্তরীক্ষ থেকে দেব-দৈত্য-গন্ধর্ব সকলেই এই যুদ্ধ দেখতে আসে। দূষণের হুংকার, অন্যদিকে রামচন্দ্রের মৃদু হাসি। হাজার হাজার রাক্ষস রামচন্দ্রকে ঘিরে ফেলেছে। কবির দৃষ্টিতে এ দৃশ্য বর্ণিত—

''বেষ্টিত রাক্ষসগণ মধ্যে রাম একা।
শৃগালবেষ্টিত যেন সিংহ যায় দেখা।"

খর ও তার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু। খর ও রামচন্দ্র উভয়েই একের পর এক বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। দু'জনেই বাণে বিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত। 'সহস্রবাণে'র আঘাতে ছয় হাজার রাক্ষস মারা যায়। একমাত্র জীবিত খর। দূষণ এই দৃশ্য দেখে শ্রীরামের প্রতি মহাশূল নিক্ষেপ করে। রামচন্দ্রের বাণে শূলসহ দূষণের দুহাত ছিন্ন হয়। রক্তাক্ত দূষণ মাটিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে এবং "জ্বালায় দূষণ ত্যজিল পরাণ।"

দূষণের মৃত্যুর পর খর ভেঙে পড়ে। তার দুচোখ জলে ভরা। প্রতিশোধের জন্য হাতে অস্ত্র নিয়ে অগ্রসর হয়। খর ও রামচন্দ্রের যুদ্ধ কৃত্তিবাসের ভাষায়—

"রাম আর খর বীর অগ্নির আকার।
দশদিক জলস্থল বাণে অন্ধকার।।"

উভয়ে উভয়ের প্রাণ হরণের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শরভঙ্গের কাছ থেকে, ধনুর্বাণ রামচন্দ্র পেয়েছিলেন। বাণ নিক্ষেপ করে খরের ধনুককে রামচন্দ্র টুকরো টুকরো করে ফেলেন। অন্য আর একটি ধনুক নিয়ে খর একের পর এক বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। নানা অস্ত্রে দশ দিক ঝলসিত। অগস্ত্যমুনি প্রদত্ত ধনুকের সাহয্যে রাম পুনরায় খরের ধনুর্বাণ কাটেন। তার রণধ্বজ পতাকা ছিন্ন-ভিন্ন করেন। একে একে খরের রথের সারথি ও রথের আটটি ঘোড়া মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। খর মন্ত্রপূতঃ গদা নিয়ে ধেয়ে যায়। গদার আগুন নেভানোর জন্য রামচন্দ্রের

বাণ নিক্ষেপ। তবু

"অগ্নি জ্বলে গদাতে না হয় শান্ত বাণে।
ত্রিভুবন একাকার ছাইল আগুনে।।"

শেষে অগ্নিবাণের দ্বারা এই আগুন নেভে। এরপর বাণে বাণে খরের শরীর হয় জর্জরিত। তার হাতে আর কোনো অস্ত্র না থাকাতে শেষে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে খর রামচন্দ্রকে কামড়াতে যায়। রামচন্দ্র 'ঐষিক বাণে'র দ্বারা খরকে দ্বিখণ্ডিত করে। খরের মৃত্যু দৃশ্য বর্ণনায় দেখা যায়—

"বজ্রাঘাতে যেমন পর্বত দুই চির।
গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খরবীর।।

বজ্রাঘাতে পর্বত যেমন দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভেঙে পড়ে ঐষিকবাণের আঘাতেও পর্বতসম বিপুল খরের দেহ খণ্ডিত হয়ে ভূতলে লুটায়।

খরের সঙ্গে রামচন্দ্রের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী ও রোমাঞ্চকর করে কৃত্তিবাস রামের বীর্য মহিমাকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা, উৎকণ্ঠা, গতি অক্ষুণ্ণ রেখে রামচন্দ্রের চারিত্রিক দৃঢ়তাকে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছেন।

জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ ঃ আকাশপথে সীতাকে হরণ করে রাবণ যখন রথেই লঙ্কাপুরীর দিকে ধাবিত তখন সীতার বক্ষভেদী আর্তিতে আকাশ বাতাস বেদনায় ম্লান। রাবণের রথ যখন দ্রুতগতিতে ধাবিত ঠিক সেই সময় 'গরুড় নন্দন' জটায়ু সীতার বুক ভাঙা কান্না শুনে আকাশে উড়ে চারদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে। তারপর রাবণের রথকে চিনতে পেরে জটায়ু—

"দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণের গালি দিয়া মারে পাখসাট।।"

তার পাখার ঝাপটানিতে রাবণ দিশেহারা। জটায়ু পাখী সীতা হরণের অপরাধের জন্য রাবণকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালি দেয় এবং তীব্র ঘৃণায় বলে—

"কি কব হয়েছি বৃদ্ধ ঠোঁট হৈল ভোঁতা।
নতুবা ফলের মত ছিঁড়িতাম মাথা।।"

একদিকে পাখার আঘাত অন্যদিকে গালা-গালি দিয়ে রাবণকে জর্জরিত করে। তুমুল যুদ্ধ চলে। জটায়ু ছোঁ মেরে রাবণের পিঠের মাংস খুবলে নেয়। নখের আঁচড়ে ও ঠোঁটের কামড়ে রাবণের রথ ভেঙে যায়। তীক্ষ্ণ ঠোঁট দ্বারা সে সারথির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ও রণধ্বজা টুকরো টুকরো হয়। ক্রোধে উন্মত্ত রাবণ নিরুপায় হয়ে সীতাকে ভূমিতে রেখে আকাশে উঠে। জটায়ু শ্রান্ত-ক্লান্ত গভীর চিন্তায় মগ্ন। সেই দেখে রাবণ ভগ্ন রথকে আবার নূতন করে সাজায় এবং সীতাকে পুনরায় রথে তুলে নেয়। তা দেখে জটায়ু দ্বিতীয়বার রাবণের সঙ্গে 'মহাযুদ্ধে' লিপ্ত হয়। সে যুদ্ধ ভয়ংকর। পরের জন্য জটায়ু কেন প্রাণ দিচ্ছে—একথা বলে তার প্রাণনাশের চেষ্টা করলে ঘোর যুদ্ধ বেধে যায়। জটায়ু ঠোঁট দিয়ে রাবণের রাজমুকুট খান খান করে, তার মাথার চুল উপড়ে নেয়। এতে—

'নিষ্কেশ হইল রাবণের দশমুণ্ড'।

রাবণ জটায়ুর উদ্দেশ্যে বত্রিশ হাজার বাণ নিক্ষেপ করে তার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। তবু সে প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে যায়। রামচন্দ্রের জন্য সাহসে ভর করে জটায়ুর লড়াই স্মরণীয়। রাবণ 'অর্দ্ধচন্দ্রবাণে' তার দু'পাখা

কেটে ফেলে। জটায়ু মাটিতে পড়ে ছট্ ফট্ করতে থাকে। তার ব্যথায় সীতা ব্যথিত আর রামচন্দ্রের ভয়ে যুদ্ধ ক্লান্ত রাবণ তড়িঘড়ি রথ নিয়ে লঙ্কার দিকে যাত্রা করে।

পাখীর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধকে কৃত্তিবাস ভিন্ন রসে বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রচনা করেছেন। অন্যান্য যুদ্ধে-শূল, গদা ও নানা বাণের ব্যবহার দেখেছি কিন্তু প্রতিপক্ষ ভিন্ন জাতীয় বলে কবি জটায়ুর তীক্ষ্ম ঠোঁট, বিশাল পাখা, নখ ইত্যাদিকে যুদ্ধাস্ত্র রূপে ব্যবহার করে এই যুদ্ধে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছেন। একের পর এক যুদ্ধ বর্ণনায় ঘটনা ধারা যাতে শিথিল না হয়, পাঠক-পাঠিকা ক্লান্ত না হয়, একঘেয়েমি দেখা না দেয়, এইজন্যই যুদ্ধটি এতো আকর্ষণীয়। জটায়ুর বলিষ্ঠ দৃপ্ত ভূমিকাও দৃষ্টান্তস্বরূপ।

(গ) চরিত্র চিত্রণ ঃ কবি কৃত্তিবাস সহজ সরল বাংলা পয়ার ত্রিপদী ছন্দে মহামুনি বাল্মীকির মূল রামায়ণের কাহিনীকে অতি-সংক্ষেপে লিখেছেন। বাঙালি জনগণের উপযোগী করে, পাঁচালীর ঢঙে এই গ্রন্থ রচিত। যার ফলে তাঁর হাতে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বাঙালির আপনজন হয়ে উঠেছে। মূল রামায়ণের চরিত্র বাঙলার কোমল-পেলব মাটির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। অরণ্যখণ্ডে'র বিভিন্ন মূল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো। আপনারা 'মূলপাঠ' পড়ে এবং এই অংশটি চর্চা করে যে-কোনো চরিত্র সম্পর্কেই অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং নিজের ভাষায় তাদের জীবনচিত্র তুলে ধরতে পারবেন। নিম্নে বিশেষ বিশেষ চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণিত হলো।

শ্রীরামচন্দ্র ঃ মূল রামায়ণে বাল্মীকিমুনি রামায়ণের কেন্দ্রীয় চরিত্র রামচন্দ্রকে বীররসে মণ্ডিত করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের হাতে চরিত্রটি ভক্তের ভগবানে পরিণত হয়েছে। অরণ্যখণ্ডে রামের ভক্তের ভগবানরূপের পাশাপাশি বীরত্বের মহিমাতেও উজ্জ্বল হয়েছে। পিতৃভক্ত রামচন্দ্র এই খণ্ডে ভ্রাতৃভক্তরূপে যেমন সুচিহ্নিত, তেমনি পত্নীর প্রতি প্রেমে-আদর্শ পতিরূপে চিত্রিত। ভক্তি নম্র রামচন্দ্র প্রয়োজনে যে রুদ্রমূর্তিও ধারণ করতে পারেন তার পরিচয় আছে। 'সীতাহারা' রামচন্দ্রের আকুল বিলাপ পাঠকের চোখে জল আনে।

অরণ্যখণ্ডের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র নানা ঘটনার সঙ্গে জড়িত। সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় ও বিরহ যন্ত্রণায় চরিত্রটি বাস্তবধর্মী হয়েছে। চিত্রকূট পর্বতে অবস্থানকালে ভীতত্রস্ত মুনিদের কানাকানিতে বুদ্ধিদীপ্ত রামচন্দ্র তাঁদের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরেই দৃঢ় চিত্তে বলেন—

> "যদি কোন বিপদ হয়েছে উপস্থিত।
> আমারে জানাও আমি করিব বিহিত।।"

এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে রামচন্দ্রের মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যের বিপদে প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়ার মহান আদর্শ লক্ষণীয়। মুনিগণের চিত্রকূট ছেড়ে চলে যাওয়া, নির্জন বনভূমিতে রূপবতী সীতাকে নিয়ে কীভাবে দিন কাটাবেন—সে গভীর চিন্তায় রামচন্দ্র মগ্ন হন। এই চিন্তার মধ্য দিয়ে রামচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যে অনুধ্যানী রূপটি প্রকাশ পেয়েছে।

অযোধ্যা থেকে চিত্রকূট বেশী দূর নয়। যে-কোনো সময় ভ্রাতৃভক্ত ভরত এসে রামচন্দ্রের পিতৃসত্য রক্ষার আদর্শভূমিকা টলাতে পারে একথা ভেবে তিনি চিত্রকূট ত্যাগ করে সুদূর দক্ষিণে যাত্রা করেন। এই সিদ্ধান্ত নেবার মধ্যে আমরা রামচন্দ্রের আদর্শের প্রতি অটল নিষ্ঠা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাই। অত্রিমুনির আশ্রমে তাঁর ভক্তি বিনম্র রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। এরপর দণ্ডকারণ্যে প্রকৃতি প্রেমিক রামচন্দ্রকে আমরা পাই। বিরাধ, খর-দূষণের সঙ্গে যুদ্ধে রামচন্দ্রের বীরত্বের পাশাপাশি, সীতার বিপদ আশঙ্কিত ভাবনা রামচন্দ্রের চরিত্রটিকে বীর্যবত্তা ও প্রেম

আলিম্পনে শৌর্য ও মাধুর্যে ভরিয়ে তুলেছে। বিশেষ বিশেষ মূহূর্তে লক্ষ্মণকে উপদেশ দেবার মধ্যে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দ্রের আগমন মূহুর্তে লক্ষ্মণকে দূরে থাকতে এবং পঞ্চবটী বনে স্বর্ণমৃগ ধরে আনার সময় লক্ষ্মণের প্রতি তাঁর নির্দেশ—

'যাবৎ মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ করহ রক্ষা লক্ষ্মণ সীতারে।।"

এছাড়া সীতার আশাপূর্ণ করার জন্য ধনুর্বাণ হাতে বনে গমন ইত্যাদির মধ্যেও পত্নীর প্রতি অনন্ত ভালোবাসার রূপটি প্রকাশ পেয়েছে।

সূর্পণখার রামচন্দ্রের প্রতি প্রেম নিবেদন কালে রামচন্দ্রের চরিত্রে রস রসিকতা ফুটে উঠেছে। রামের জীবন সঙ্গিনী হবার জন্য যখন সূর্পণখা নাছোড়বান্দা তখন পরিহাস ছলে রামচন্দ্র বলেন—

"আমার হইলে জায়া পাবে যে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও সে বড় গুণী।।"

তিনি আরো বলেন—

"লক্ষ্মণ কনকবর্ণ পরমসুন্দর।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা নাই তুমি কর বর।।"

এইরূপ টুকরো টুকরো কথার ফাঁকে রামচন্দ্রের পরিহাসপ্রিয় মধুর চারিত্রিক ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে পড়েছে।

'শ্রীরামচন্দ্রের বিপাল ও সীতার অন্বেষণ' পর্বে আশঙ্কাকুল রামচন্দ্রের রূপের পাশাপাশি লক্ষ্মণের প্রতি তাঁর আকুল প্রশ্ন—

"শুনরে লক্ষ্মণ সেই সোনার পুতুলি।
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি।।"

কর্মযোগী রামচন্দ্র হয়েছেন অদৃষ্টবাদী। পত্নী প্রেমের অনন্তরূপ রামচন্দ্রের আদর্শ পতিসত্তাকে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়েছে। তন্ন তন্ন করে সব জায়গায় খুঁজেও সীতাকে না পেয়ে 'সীতা-সীতা' করে পাগল পারা হন। তাঁর বুক ভাঙা কান্নায় বনের পশু-পাখীও কাঁদতে থাকে। মুনিগণ ছুটে আসেন। কিন্তু তাঁর মুখে শুধু 'সীতা'। ভাইকে বলেন—

"কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।"

বিচ্ছেদ যন্ত্রণা কাতর রামচন্দ্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় গভীর পত্নী প্রেম। স্ত্রীর প্রতি রামচন্দ্রের অনন্ত প্রেম কবি প্রস্ফুটিত করতে লিখেছেন—

"সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণি হারা ফণী।।"

অরণ্যখণ্ডের এই অংশটিতে প্রেম ভীরু কোমল মধুর রূপটি কৃত্তিবাস করুণ রসের ধারায় স্নাত করে বীর